সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিমিত বাক্‌বিন্যাসের নাম **ছন্দ**। আমাদের নিত্যকথিত বা গঠিত গদ্য ভাষার ধ্বনিপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিমিত রূপে বিন্যস্ত করলেই পদ্যের ছন্দ উৎপন্ন হয়।

পদ্যছন্দও সংগীতের ন্যায় একটি ধ্বনিশিল্প। কিন্তু সংগীত মূলতঃ বাক্‌নির্ভর নয়। যন্ত্রসংগীতই তার প্রমাণ। উচ্চাঙ্গের কণ্ঠসংগীতও অনেকাংশেই বাক্‌নিরপেক্ষ। কিন্তু পদ্যছন্দ একান্তভাবেই বাক্‌নির্ভর। আমাদের নিত্যকথিত ও পঠিত ভাষার উচ্চারণ ও শ্রুতিই পদ্যছন্দের মূল আশ্রয়। সংগীতেরও ছন্দ আছে এবং পদ্যছন্দ ও গীতছন্দের সাদৃশ্য পার্থক্যের আলোচনাও ঔৎসুক্যজনক। এ সম্পর্কে প্রধান স্মরণীয় বিষয় এই যে, গীতছন্দ সর্বদাই বাক্যের গতিভঙ্গি তথা ভাবের অনুবর্তী না হতেও পারে। যেমন—

ঐ আসে | 'ঐ অতি' | ভৈরব | হরষে
'জলসিঞ্চ' | 'চিতক্ষিতি' | সৌরভ | রভসে।

—কল্পনা, বর্ষামঙ্গল

এটা হচ্ছে গীতছন্দের ভঙ্গি। বলা বাহুল্য, এটা আমাদের বাক্‌ভঙ্গির অনুবর্তী নয়। অন্ততঃ তিন স্থলে বাক্‌ভঙ্গি লঙ্ঘিত হয়েছে। স্বাভাবিক বাক্‌বিন্যাসের ভঙ্গি হচ্ছে এরকম।—

ঐ আসে ঐ | অতি ভৈরব | হরষে
জলসিঞ্চিত | ক্ষিতিসৌরভ | রভসে।

বাক্‌বিন্যাস স্বভাবতঃই নির্ভর করে ভাষাগত ভাবের উপরে। সংগীতের পক্ষে তা অলঙ্ঘনীয় নয়। পক্ষান্তরে বাক্‌বিন্যাস তথা ভাববিন্যাসের ভঙ্গিকে যথাসম্ভব রক্ষা করে চলাই পদ্যছন্দের নীতি।

ভাষার গতি, বিরতি ও ছন্দস্পন্দ

আমাদের কথিত বা গঠিত গদ্যভাষার ভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানতঃ তার গতি ও বিরতির দ্বারা। মুখের ভাষা কখনও একটানা চলে না। মাঝে মাঝে থামে, আবার চলে। যেমন—

গদ্যসাহিত্যের আরম্ভ থেকেই | তার মধ্যে প্রবেশ করেছে | ছন্দের অন্তঃশীলা ধারা। রস যেখানেই চঞ্চল হয়েছে, | সেখানেই শব্দগুচ্ছ | স্বতই সজ্জিত হয়ে উঠেছে। ভাবরসপ্রধান | গদ্য আবৃত্তির মধ্যে | সুর

Scanned by CamScanner

লাগে, | অথচ তাকে | রাগিণী বলা চলে না, | তাতে তালমানসুরের | আভাসমাত্র আছে। তেমনি গদ্যরচনায় | যেখানে রসের আবির্ভাব | সেখানে ছন্দ | অতিনির্দিষ্ট রূপ নেয় না, | কেবল তার মধ্যে থেকে যায় | ছন্দের গতিলীলা।

—রবীন্দ্রনাথ, 'ছন্দ' (১৯৭৬), গদ্যছন্দ, পৃ ২১৪

এই হচ্ছে গদ্যের স্বাভাবিক গতিভঙ্গি। ভাষার গতি যেখানে-যেখানে থেমেছে, সেই স্থানগুলি নির্দিষ্ট হল বিরতিসূচক দণ্ডচিহ্নের দ্বারা। পাঠকের অভিরুচি অনুসারে এগুলির কিছু ইতরবিশেষ হতে পারে কিন্তু যথেচ্ছ বিরতি ঘটানো চলে না। মোট কথা, গদ্যভাষারও একটা ভঙ্গি আছে, সে ভঙ্গি দেখা দেয় তার ভাবগত গতি ও বিরতির ফলে। আর তারই প্রভাবে 'শব্দগুচ্ছ স্বতই সজ্জিত' হয়ে ওঠে। এই যে গতি ও বিরতির স্বতঃসজ্জিত শব্দগুচ্ছ, তাকে বলি **বাক্‌পর্ব**। প্রত্যেক বাক্‌পর্বের প্রথমেই থাকে একটি করে ঝোঁকের বেগ, আর ওই বেগজাত গতির বিরতি ঘটে বাক্‌পর্বের শেষে। এই বেগ ও বিরতি ভাষাকে তরঙ্গিত করে তোলে। ভাষার এই তরঙ্গিত ভঙ্গিকেই বলি 'ছন্দ'।

গদ্য ও পদ্যের ছন্দ একরূপ নয়। গদ্যভাষার ছন্দ কখনও 'অতিনির্দিষ্ট রূপ নেয় না'। এই অনতিনির্দিষ্ট বা 'অনতিনিরূপিত'[১] গদ্যছন্দকে বলতে পারি **'বাক্‌ছন্দ'** (speech rhythm)। বেগ ও বিরতি-জাত এই যে উত্থানপতনময় তরঙ্গভঙ্গি, তারই সাধারণ নাম **ছন্দস্পন্দ** (rhythm)। এই ছন্দস্পন্দ গদ্য ও পদ্য উভয় ভাষাতেই আছে। গদ্যের ছন্দস্পন্দ অনির্দিষ্ট বা অনিরূপিত, কেননা তার পর্বগুলি অপরিমিত (unmeasured)। পদ্যের ছন্দস্পন্দ সুনির্দিষ্ট বা সুনিরূপিত, কেননা তার পর্বগুলি সুপরিমিত (measured)। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বলা যায়,—গদ্যের গতিকে যথার্থ ছন্দ বলা চলে না, কারণ তাতে সুপরিমিত পর্ব থাকে না, তার 'আভাসমাত্র' থাকে। সুপরিমিত ছন্দপর্বের এই আভাসটুকুকেই তিনি বলেছেন 'ছন্দের গতিলীলা'। গদ্যের গতিতে যথার্থ ছন্দ থাকে না, থাকে তার লীলাটুকু মাত্র। ছন্দ-আলোচনায় যার পারিভাষিক নাম ছন্দস্পন্দ, রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন 'ছন্দের গতিলীলা'।

প্রস্বর ও যতি

গদ্য ও পদ্যের প্রধানতম পার্থক্য এই যে, **গদ্যস্পন্দ** (prose rhythm) উৎপন্ন হয় অপরিমিত পর্বযোগে আর **পদ্যস্পন্দ** (verse rhythm) উৎপন্ন হয় সুপরিমিত পর্বযোগে। পদ্যরচনার পর্ব কিভাবে পরিমিত হয় তা নির্ণয় করাই ছন্দশাস্ত্রের প্রাথমিক কাজ। এই কাজের জন্য প্রথম প্রয়োজন পদ্যরচনার পর্ববিভাগ করা। পূর্বেই বলা হয়েছে, পর্বের প্রথমেই থাকে একটি করে ঝোঁক, আর তার শেষে থাকে বিরতি ; এই বিরতির দ্বারা ঝোঁকের বেগের অবসান সূচিত হয়। এই ঝোঁকের পারিভাষিক নাম **প্রস্বর** (accent)। আর ছন্দের

১· দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যের (১৯৩২) ভূমিকা অথবা 'ছন্দ' গ্রন্থ (তৃতীয় সং, ১৯৭৬), পৃ· ২০২।

Scanned by CamScanner

পরিভাষায় পর্বগতির অবসানসূচক বিরতিকে বলা হয় **যতি** (pause)। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

আজি কি তোমার | মধুর মূরতি || হেরিনু শারদ | প্রভাতে,
হে মাত বঙ্গ, | শ্যামল অঙ্গ || ঝলিছে অমল | শোভাতে।

—কল্পনা, শরৎ

প্রতি পর্বের আদ্যক্ষরের শীর্ষস্থ তির্যক্ রেখাটি প্রস্বরসূচক, আর প্রতি পর্বের পার্শ্বস্থ দণ্ডচিহ্নটি যতিসূচক। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক লাইনের শেষেও একটি করে যতি আছে, সেটি কোনো চিহ্নযোগে নির্দিষ্ট হয়নি।

যতির তারতম্য

পূর্ণযতি, অর্ধযতি, লঘুযতি, উপযতি ও অণুযতি

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটির প্রত্যেক লাইনেই চারটি করে যতি আছে। একটু মন দিয়ে শুনলেই টের পাওয়া যাবে যে, ওই সবগুলি যতি সমান পর্যায়ের নয়—ওগুলির মধ্যে তারতম্য ভেদ আছে। প্রত্যেক লাইনের প্রথম ও তৃতীয় যতি-দুটি স্পষ্ট অনুভূত হলেও দ্বিতীয় ও চতুর্থ যতির তুলনাও অপেক্ষাকৃত লঘু। দ্বিতীয় যতিটি প্রথম ও তৃতীয়র তুলনায় স্পষ্টতর, অর্থাৎ এটির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি। আর শেষ অর্থাৎ চতুর্থ যতিটি স্পষ্টতম, এটির গুরুত্ব সব চেয়ে বেশি। ছন্দের পরিভাষায় প্রথম ও তৃতীয়, এই দুটি যতিকে বলা যায় **লঘুযতি**, আর চতুর্থ অর্থাৎ শেষ যতিটিকে বলা যায় **পূর্ণযতি**। দ্বিতীয় যতিটির গুরুত্ব এই দুই-এর মধ্যবর্তী, অতএব এটিকে বলা যায় **অর্ধযতি**। এই তিন রকম যতির পার্থক্য দেখাবার জন্য তিন রকম যতি চিহ্নের প্রয়োজন। যেমন—

চন্দ্র যখন | অস্তে নামিল || তখনো রয়েছে | রাতি,
পূর্ব দিকের | অলস নয়নে || মেলিছে রক্ত | ভাতি।

—চিত্রা, সিন্ধুপারে

প্রথম ও তৃতীয় পর্বের পরে লঘুযতি, দ্বিতীয় পর্বের পরে অর্ধযতি আর সর্বশেষে পূর্ণযতি। সব সময় পূর্ণযতি-সূচক কোনো চিহ্ন না দিলেও চলে, অর্থাৎ উহ্য রাখা চলে। এই গ্রন্থের পরবর্তী সব দৃষ্টান্তেই পূর্ণযতির চিহ্ন উহ্য থাকবে। তাছাড়া, প্রস্বরচিহ্নও সর্বত্র দেখানো নিষ্প্রয়োজন। উপরের দৃষ্টান্তটিতেও প্রস্বরচিহ্ন উহ্য আছে। অন্য সব দৃষ্টান্তেও তাই থাকবে।

আরও নিবিষ্টভাবে মন দিয়ে শুনলে বোঝা যাবে প্রত্যেক পর্বের মধ্যেও একটি লঘুতর যতি আছে। পর্বের মধ্যবর্তী এই লঘুতর যতিকে বলি **উপযতি**। প্রয়োজনমতো (:) এই **দ্বিবিন্দু দণ্ড** চিহ্ন দিয়ে উপযতির অবস্থান নির্দেশ করা যায়। যেমন—

চন্দ্র : যখন | অস্তে : নামিল||তখনো : রয়েছে | রাতি,
পূর্ব : দিকের | অলস : নয়নে|| মেলিছে : রক্ত | ভাতি।

যখন শুধু পর্ববিভাগ দেখানোই উদ্দেশ্য হয় তখন অর্ধযতির চিহ্নটিকে উহ্য

Scanned by CamScanner

রাখতে হয়। এখানে তাই করা হয়েছে। পূর্ণযতি এবং প্রস্বরচিহ্নও উহ্য আছে। এই দৃষ্টান্তে শুধু উপযতির অবস্থানই নির্দেশ করা গেল দ্বিবিন্দু-দণ্ড চিহ্ন দিয়ে।

একটু তলিয়ে দেখলে সহজেই বোঝা যাবে যে, যে-কোনো বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দও আমাদের মুখে স্বভাবতঃই টুকরো-টুকরো হয়ে উচ্চারিত হয়। কোনো-কোনো শব্দ উচ্চারিত হয় এক টুকরো রূপেই যেমন—না, কি, সে, মাস্, দিন্, ফুল্। আবার কোনো-কোনো শব্দ উচ্চারিত হয় দুই বা ততোধিক টুকরো হয়ে। যেমন—ন·দী, সুপ্·তি, আ·কাশ্, ক·বি·তা, ব·সন্·ত ইত্যাদি। আমাদের মুখে এ-রকম প্রত্যেকটি টুকরো বা খণ্ডের পরেই একটু বিরতি ঘটে, যেমন আমাদের চলার সময় প্রতি পদক্ষেপের পরেই ঘটে ক্ষণিক বিরতি। বাক্যগত এ-রকম ধ্বনিখণ্ডের পরবর্তী ক্ষণিক বিরতিকে ছন্দ-পরিভাষায় বলি **অণুযতি**। আর এ-রকম ধ্বনিখণ্ডকে বলি **দল** (syllable)। এই দলের কথা পরে বলা যাবে বিশদভাবে। এবার উপরের দৃষ্টান্তটিতে প্রতিশব্দের অন্তর্গত অণুযতির অবস্থান দেখানো যাক **একবিন্দু** (·) চিহ্ন যোগে।—

চন্·দ্র য·খন্। অস্·তে না·মি·ল ॥ ত·খ·নো র·য়ে·ছে। রা·তি,
পূর্·ব দি·কের। অ·লস্ ন·য়·নে ॥ মে·লি·ছে রক্·ত। ভা·তি।

শব্দের শেষ ধ্বনিখণ্ডের পরবর্তী অণুযতি-চিহ্নটিকে সহজেই উহ্য রাখা যায়। আর উপযতি, লঘুযতি প্রভৃতি যতিচিহ্নের পূর্বে অনুরূপ অণুযতি-চিহ্ন রাখা একেবারেই অনাবশ্যক। এই দৃষ্টান্তেও সব শব্দেরই শেষ অণুযতির চিহ্ন উহ্য আছে। এই নীতি সর্বত্রই সমভাবে অনুসৃত হতে পারে।

যতিবিভাগ

পঙ্‌ক্তি, পদ, পর্ব, উপপর্ব ও দল

বিভিন্ন রকম যতির দ্বারা নির্দিষ্ট ছন্দোবিভাগগুলির বিভিন্ন নাম থাকাও প্রয়োজন। তাই পূর্ণযতির দ্বারা নির্দিষ্ট ছন্দোবিভাগকে বলব পঙ্‌ক্তি। অর্থাৎ ছন্দের পূর্ণযতিবিভাগের পারিভাষিক নাম **পঙ্‌ক্তি** (verse)। তেমনি অর্ধযতিনির্দিষ্ট ছন্দোবিভাগের নাম **পদ** (clause), লঘুযতি-বিভাগের নাম **পর্ব** (foot), উপযতি-বিভাগের নাম **উপপর্ব** (sub-foot), আর অণুযতি-বিভাগের অর্থাৎ ধ্বনিখণ্ডের নাম **দল** (syllable)।

এইসব ছন্দোবিভাগের নাম অনুসারে পূর্ণযতিকে **পঙ্‌ক্তিযতি**, অর্ধযতিকে **পদযতি**, লঘুযতিকে **পর্বযতি**, উপযতিকে **উপপর্বযতি** এবং অণুযতিকে **দলযতি** নামেও অভিহিত করা যায়।

উপরের দুটি দৃষ্টান্তেই প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আছে দুই পদ ; আর প্রতি পদে আছে দুই পর্ব। অর্থাৎ এই দুই দৃষ্টান্তেরই প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী ও প্রত্যেক পদ দ্বিপর্বক। উভয়ত্রই পঙ্‌ক্তির শেষ পর্বগুলি স্পষ্টতঃই অপূর্ণ। বাংলা ছন্দে অধিকাংশ স্থলেই পঙ্‌ক্তির শেষপ্রান্তস্থিত পর্ব অপূর্ণ থাকে।

এবার অন্যরকম একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

Scanned by CamScanner

শীর্ণ শান্ত। সাধু তব ॥ পুত্রদের। ধরে,
দাও সবে। গৃহছাড়া ॥ লক্ষ্মীছাড়া। করে।

—চৈতালি. বঙ্গমাতা

এই দৃষ্টান্তেও প্রতি পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী, প্রতি পদ দ্বিপর্বক এবং শেষ পর্ব অপূর্ণ। তাছাড়া পূর্ববর্তী দুই দৃষ্টান্তের মতো এটিতেও প্রতি পূর্ণ পর্বে আছে দুই উপপর্ব। কিন্তু কানের সাক্ষ্যেই বোঝা যায়, পঙ্‌ক্তি পদ ও পর্বের এই বর্ণনার অভিন্নতা সত্ত্বেও এই দৃষ্টান্তটি আকৃতি ও প্রকৃতি উভয় দিক্ থেকেই পূর্ববর্তী দুটি দৃষ্টান্ত থেকে বহুলাংশেই পৃথক্। যথাস্থানে এই পার্থক্যের কারণ নির্দেশ করা যাবে।

এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে, ছন্দের **পঙ্‌ক্তি** (verse বা metrical line) আর মুদ্রিত বা লিখিত **ছত্র** (printed বা written line) এক নয়। একই ছন্দপঙ্‌ক্তিকে অভিরুচি বা প্রয়োজনমতো একাধিক ছত্রে সাজিয়ে লেখা যায় বা লিখতে হয়। এসব ক্ষেত্রে পঙ্‌ক্তিগুলিকে সাধারণতঃ অর্ধযতিতে বিভক্ত করে দুই বা ততোধিক ছত্রে সাজানো হয়। কখনও কখনও লঘুযতি অনুসারেও ছত্রভাগ করা যায়। কিন্তু যথেচ্ছ ভাগ করা কখনও চলে না।

ছন্দপঙ্‌ক্তিকে অর্ধযতি বা লঘুযতি অনুসারে একাধিক ছত্রে সাজিয়ে লেখা হলে আর চিহ্ন দিয়ে যতিবিভাগ দেখাবার প্রয়োজন থাকে না। অর্ধযতি বা লঘুযতি চিহ্ন তখন উহ্য থাকে।

অর্ধযতি বা পদযতি (medial pause, caesural pause) অনুসারে পঙ্‌ক্তি বিভাগের দৃষ্টান্ত এই।—

লেখে স্বর্গে মর্তে মিলে
দ্বিপদীর শ্লোক—
আকাশ প্রথম পদে
লিখিল আলোক
ধরণী শ্যামল পত্রে
বুলাইল তুলি,
লিখিল আলোর মিল
নির্মল শিউলি।

—স্ফুলিঙ্গ-২২৩, 'লেখে স্বর্গে মর্তে'

এই রচনাটিতে আছে মোট চার পঙ্‌ক্তি। প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী এবং পদযতি অনুসারে বিভক্ত হয়ে দুই ছত্রে সজ্জিত। বলা বাহুল্য, পঙ্‌ক্তিগুলিকে ভেঙে দুই ছত্রে না সাজিয়ে অনায়াসেই এক ছত্রেও সাজানো যায়। আর-একটা দৃষ্টান্ত এই।—

মুদিত আলোর | কমলকলিকা | -টিরে
রেখেছে সন্ধ্যা | আঁধার পর্ণ | -পুটে।
উতরিবে যবে | নবপ্রভাতের | তীরে
তরুণ কমল | আপনি উঠিবে | ফুটে।

Scanned by CamScanner

উদয়াচলের | সে তীর্থপথে | আমি
চলেছি একেলা | সন্ধ্যার অনু | -গামী,
দিনান্ত মোর | দিগন্তে পড়ে | লুটে ॥

—গীতালি-১০৭, 'মুদিত আলোর',

এই দৃষ্টান্তটিতে আছে মোট তিন পঙ্‌ক্তি, পদে পদে ভেঙে সাত ছত্রে সাজানো। প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী, তৃতীয় পঙ্‌ক্তি ত্রিপদী। প্রত্যেক পদে তিন পর্ব, শেষ পর্ব অপূর্ণ।

পর্বে পর্বে বিভাজনের দৃষ্টান্ত এই।—

বুকভরা মধু | বঙ্গের বধূ || জল লয়ে যায় | ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ | করে আনচান || চোখে আসে জল | ভরে।

—চিত্রা, দুই বিঘা জমি

এই দৃষ্টান্তের 'দ্বিপদী' পঙ্‌ক্তিগুলিকে পর্বে-পর্বে ভেঙে তিন বা চার ছত্রেও লেখা যায়। যেমন—

বুকভরা মধু
বঙ্গের বধূ
জল লয়ে যায় | ঘরে।

শেষ অপূর্ণ পর্বটিকে ('ঘরে') বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে চার ছত্রও করা যেতে পারে। অনেক সময় পঙ্‌ক্তি ভাঙার অন্যতম উদ্দেশ্য হয় পর্বপ্রান্তিক (বা পদপ্রান্তিক) মিলকে ফুটিয়ে তোলা। উপরের দৃষ্টান্তটিতে প্রথম দুই পর্বের পরেই মিল আছে, তৃতীয় পর্বের পরে নেই। তাই তৃতীয় ও চতুর্থ (অপূর্ণ) পর্বকে এক ছত্রেই রাখা হয়েছে। এ-রকম রচনাকে অনেক সময় দুই ছত্রেও সজানো হয়। যেমন—

বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ
জল লয়ে যায় ঘরে।

মিল দেখাবার প্রয়োজনে প্রথম ছত্রে দুই পর্বের বা পদের মধ্যে খানিকটা ফাঁক রাখা হয়। এসব স্থলেও যতিচিহ্ন উহ্য রাখা যায়।

এস্থলে বলা প্রয়োজন যে, প্রচলিত প্রথায় এইজাতীয় রচনাকে বলা হয় 'ত্রিপদী'। বস্তুতঃ এসব রচনাকে ত্রিপদী বলা সমীচীন নয়। কেননা, 'বুকভরা মধু'-র ন্যায় লঘুযতির বিভাগকে 'পদ' বলার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। পর্বে-পর্বে মিল থাকলেই তাকে 'পদ' বলা যায় না। যেমন—

শলাকাবিদ্ধ | হতেছে সিদ্ধ || মনুনিষিদ্ধ | পক্ষী।

—কল্পনা, উন্নতিলক্ষণ

নৌকা ফি সন | ডুবিছে ভীষণ || রেলে কলিশন | হয়।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, হাসির গান

এসব স্থলে তিন পর্বে মিল আছে বলেই এ ধরনের পঙ্‌ক্তিকে চৌপদী বলা চলে না। অর্ধযতির প্রতি দৃষ্টি রেখে দ্বিপদী বলাই সমীচীন। পক্ষান্তরে

ভোরের গগনে | অরুণ উঠিতে || কমল মেলেছে | আঁখি,
নবীন আষাঢ় | যেমনি এসেছে || চাতক উঠেছে | ডাকি।

Scanned by CamScanner